অসম

উম্মে মুসলিমা

নুজহাত ছোটবেলা থেকেই পাকার ডিম। সমবয়েসীরা যারা ওর সাথে পড়তো ওরা কেউই নুজহাতের বন্ধু ছিল না। ও যখন ক্লাস এইটে তখন ক্লাস টেনের শাহিন ছিল ওর জানি দোস্। ক্লাসমেটরা টিফিনের অবসরে খেলা বাদ দিয়ে নুজহাতের সমালোচনায় মুখর হতো। নুজহাত তার বড় একটা ধার ধারতো না। একবার ক্লাস নাইনে উঠে ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল ইয়াসমিনের সাথে ওর লেগে গেল। নুজহাত সাফ বলে দিল -

'যারা এখনও নিহাররঞ্জন গুপ্ত পড়ে শিহরিত হয় তাদের আমি কর"ণা করি'

'কেন নীহাররঞ্জন কিসে খারাপ হলো শুনি? তুই কার বই পড়িস? নিজেকে কী ভাবিস তুই?'

'স্রেফ তোদের বস্। আর আমি যেসব রাইটারদের বই পড়ি তাদের লেখা পড়তে তোদের আরো ত্রিশ বছর পার করতে হবে'

কলেজে পড়ার সময় তো নুজহাতের টিকি দেখতে পেতনা ওর ক্লাসমেটরা। উঁচু ক্লাসের মেধাবী ছেলেগুলো অফ পিরিওডে নুজহাতের সাথে মাঠে বসে আড্ডা দিত। কলেজের লাইব্রেরীর যত বই ও ওর কাজিনের সুবাদে স্কুলে থাকতেই শেষ করে ফেলেছে। অধ্যক্ষের কক্ষের রাজনীতির বইগুলোর উপর ওর খুব নজর। পাঠ্য বইয়ে ওর মোটেও মন ভরে না। কলেজের ডিবেট, উপস্থিত বক্তৃতা, গল্প বলা এমন কি পাশাপাশি বর্শা নিক্ষেপেও নুজহাতকে কেউ হারাতে পারেনি। ছেলেরা বলতো –

'ইস তুই যদি ছেলে হতি!'

'ছেলে হলে একটা লেজ গজাতো না। আমার তো কোনো অসুবিধা হয় না। তোদের হলে কেটে পড়তে পারিস'

মেয়েদের মতো সাজগোজ নুজহাতের একটুও পছন্দ ছিল না। জিনসের প্যান্ট আর ফতুয়া ছিল ওর সার্বক্ষনিক পোশাক। ভেজা থাকলে চুল খোলা, না হলে একটা হাতখোপা। প্রসাধনের ধার ধারে না। তবু দুই গালে যেন লাবন্যের বন্যা। চোখে একটানা বিস্ময়। এই দুরন্ত কিন্তু

শিশুর মতো সরল মেয়েটিকে কলেজ শিক্ষকদের অনেকেই অপছন্দ করতো। কেননা ও মোটেই ক্লাসের পড়াশুনা করে আসতো না। কিন্তু কী কারণে যেন অধ্যক্ষ সাহেব নুজহাতের প্রতি খুব সদয় ছিলেন। এক্সট্রা কারিকুলাম একটিভিটিজে সে অধ্যক্ষের নজর কেড়েছিল আগেই। তারপরেও নুজহাতের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মেয়েটির মধ্যে জিনিস আছে। পড়াশুনা করলে মেয়েটি একটা ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করতে পারে তা তিনি সবাইকে বলে দিয়েছিলেন। আর ওর চেহারাটা এমন যে দেখলেই কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করতো। ওর প্রতি অধ্যক্ষের অনাবশ্যক স্নেহও ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের চক্ষুশূল। ও যখন তখন অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের দুর্লভ বইটি পড়ার জন্যে চাইলেই পেয়ে যেত। ওই বই পড়তে গিয়ে হয়তো দুদিন ক্লাসেই আসতো না। পরীক্ষা থাকলে বন্ধুরা ওকে পাগলের মতো হেল্প করতো। মেধাবী ছেলেগুলোকে ও বলতো –

'তোরা প্লিজ আধঘন্টা করে আমাকে বিষয়গুলো একটু বুঝিয়ে দে। পড়ে আমি পাশ করতে পারবো না'।

মোটামুটি কানের গোড়া দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়ে নুজহাত ডিগ্রি পাশ করলো। ওর সে কি আনন্দ! ওর গোপন ইচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স করা। ওর মধ্যবিত্ত বাবার যে খুব সংগতি ছিল তাও নয়। কিন্তু মেয়ে গোঁ ধরেছে তাই তিনি একবার অধ্যক্ষের কাছে গেলেন পরামর্শের জন্যে। হয়তো বা চাচ্ছিলেন তিনি যেন না-ই করে দেন। কিন্তু তার বদলে অধ্যক্ষ সাহেব নুজহাতকে নিজের পুত্রবধু করার প্রস্তাব দিলেন নুজহাতের বাবাকে। ছেলে তার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ঢাকায় ভালো চাকরি করে। বিয়ের পরেও নুজহাতের পড়াশুনায় বাঁধা থাকবে না। নিজের অসামর্থতা ও পড়াশুনার সুযোগের কথা বলে টলে নুজহাতকে বাবা রাজি করালেন। নুজহাত অবুঝ নয়। তার বাবার সংগতির কথা যে সে জানে না তা নয়। তবুও তার প্রিয় স্বাধীনতা এতো তাড়াতাড়ি বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়বে ভেবে সে ভয়ে শিউরে ওঠে। বন্ধুরা কেউ কেউ ওকে রাজি হতে বলে, কেউ আবার করে ঘোর বিরোধীতা। এসব নাকি নুজহাতের চমৎকার ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দেবার ষড়যন্ত্র। ওরা ভাবছিল নুজহাতের যা চরিত্র তাতে বিয়ে তো করবেই না ও নির্ঘাৎ কোথাও পালিয়ে যাবে। কেননা নুজহাতের অপ্রত্যাশিত আচরণে বন্ধুরা অভ্যস্ত। একবার ফেব্রুয়ারিতে কাউকে না বলে-কয়ে দুম্ করে ও ঢাকায় চলে গিয়েছিল। একুশের বইমেলা উপলক্ষে ওদের সিনিয়র এক আপার কাছে হলে গিয়ে উঠেছিল। সাতদিন মেলায় ঘুরে বেশ কয়েকটা পছন্দের বই কিনে কলেজে হাজির। ইয়ার ফাইনালের মাত্র দুদিন আগে। কিন্তু নুজহাত আসলে এরকমই। ও একটা বইয়ের পোকা। যদি কোন বই ওর ভালো লেগে যায় ওকে ক্লাসে কেউ খুঁজে পায় না। ও তখন ঠিক লাইব্রেরীর পেছনে কাঁঠাল গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে হাতের বই শেষ না হওয়া পর্যন্ত

কারো সাথে একটা কথাও বলে না। নুজহাতকে ওর ক্লাসের মেয়েবন্ধুরা বলে অহংকারী। নুজহাত কিন্তু নিজে তা কখনোই মনে করে না। ও বলে-

'তোদের সাথে বসে দুদণ্ড যে কথা বলবো, তার বিষয়টা কী? না, লেটেস্ট হিন্দি সিনেমা, নাহয় হুমায়ুন আহমেদ আর না হলে কার কবে ভালো বিয়ের সম্মন্ধ আসছে এই গপ্পো। আমার সাথে কথা বলতে হলে ভার্জিনিয়া উলফের এ বইটা ধর। কাল পড়ে এসে জমিয়ে অলোচনা করবি।'

তো এহেন পাকা মেয়ের বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা ঐ কলেজের উপরের ইয়ারের দু একজন বইয়ের পোকা ছেলে ছাড়া আর কেউ যে হতে পারে না তা পরবর্তীতে সবাই বুঝে নিয়েছিল। প্রিন্সিপালের ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সাথে যখন নুজহাতের বিয়ের কথা প্রায় পাকা হয়ে গেল তখন ওর ঘনিষ্ট বন্ধুরা ওকে সমবেদনা জানাতে ওদের বাসায় ছুটে এলো। ওরা ভেবেছিল কেঁদে কেটে দুইচোখ লাল করে নুজহাত ওদের কাছে এসে ভেঙে পড়ে বলবে -'এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না, আমি কালই পালিয়ে যে দিকে দু চোখ যায় চলে যাবো'। কিন্তু বন্ধুদের দেখে নুজহাত একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো-

'ওশ্ শালারা, এতো দেরিতে অভিনন্দন জানাতে আসলি? কিরে, খুশী হোসনি তোরা? যাব্বাবা, জেলাস নাকি বে?'

বন্ধুরা রীতিমতো হতবাক! ওরা কী ভেবেছিল আর এ মেয়ে কী? পারলে যেন এখনি তুর্কি নাচন জুড়ে দেয়! ওর সবচে জানি দোস্ত শাহিন শেষমেশ হতাশ গলায় বলে উঠে গেল -'সত্যি নুজু, ইউ আর রিয়েলি আনপ্রিডিকটেবল্' ।কিন্তু নুজহাত ওর বাবার অবস্থা বোঝে। ওর ছোট আরও তিনভাইবোনকে লেখাপড়া করাতে গেলে নুজহাতকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো প্রায় অসম্ভব ছিল। এটাও যেমন সত্যি তেমনি তারও চেয়ে বেশি সত্যি এ বিয়েতে রাজি হওয়ার পেছনে নুজহাতের অন্য একটি মতলব কাজ করেছে। সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপালের বাসায় একটা বেশ বড়সড় ব্যক্তিগত লাইব্রেরির দিকে নুজহাতের দীর্ঘদিনের লোভ। আবার বরকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেনি তাও না। এতবড় একটা পড়ুয়া বাড়ির ভালো রেজাল্টধারী ছেলে নিশ্চয় খুব ম্যাচিওর আর বিদগ্ধ হবে ভেবে নুজহাত একটু পুলকিত হয়েও উঠেছিল। উচ্চশিক্ষিত হবুশ্বশুরের সান্নিধ্যলাভের একটা আকর্ষণও নুজহাতের কম ছিল না। বন্ধুরা রাতদিন খেটেখুটে নুজহাতের বিয়ে তুলে দিল। ওর স্বভাবজাত আচরণে বন্ধুরা ব্যথা পেলেও অবাক হলো না - বিদায় মুহূর্তে বন্ধুরা কেঁদেকেটে অস্থির, নুজহাত হাসতে হাসতে একহাতে বরের হাত ধরে অন্যহাতে অনভ্যস্ত ঘোমটা সামলিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়লো।

বরের সাথে ঢাকা যাওয়ার আগে চারদিন প্রিন্সিপাল শ্বশুরের বাড়িতে মহা আনন্দে কাটিয়ে গেল নুজহাত। দুর থেকে যতখানি ভেবেছিল কাছ থেকে তার শ্বশুর আরো অনেক বেশি প্রাজ্ঞ, মিশুক, আমুদে আর ওর মতোই বইয়ের পোকা। শ্বশুরের পারিবারিক লাইব্রেরিতে ঢুকে নুজহাতের কেবল মনে হ”ছিল ও কখন পুরোনো হবে আর কখন নতুনত্বের সব সামাজিকতা শেষ করে সে কেবল লাইব্রেরিতেই পড়ে থাকতে পারবে। ওর বন্ধুরা ওকে ঢাকায় তুলে দিতে এলে ওর আনন্দিত মুখ দেখে সবাই স্বস্তি পেল। একান্তে ওকে ওর বর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ও বললো-

‘ঠিক বুঝতে পারছি না। যে বাবার ছেলে, ভালো হওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে স্যার ইজ এক্সিলেন্ট।’

‘এখনও স্যার? কেন বাবা বলে ডাকিস না?’

‘ওসব উল্টাপাল্টা ডাক আমার আসে না। আর ওনারও আপত্তি নেই।’

‘ঢাকা থেকে আবার কবে আসবি?’

‘স্যারের ছেলের বাসায় যদি এরকম একটা লাইব্রেরি না পাই, তবে একেবারেও চলে আসতে পারি’।

অলুক্ষণে কথা ওর মুখে একটুও আটকায় না। বন্ধুরা ওকে বিদায় দিল তবে ওর চোখে মুখে একটা অস্থিরতার ছায়া ওদের নজর এড়ালো না। হতে পারে বরের সাথে প্রথম প্রেমের মান অভিমানের পালা টালা চলছে। তবে ও মেয়ে কখন কী করে ফেলে বন্ধুরা আগের মতোই সে আশঙ্কা নিয়ে ঘরে ফিরলো।

নুজহাত তার ঢাকার বাসায় একটা উনত্রিশ ইঞ্চি টিভি পেল। আধুনিক সোফা-ডিভান-কার্পেটে মোড়া উষ্ণ ড্রইংর”ম পেল। বারান্দার টবে পেল নানাজাতের গাছের সমারোহ। আর দেয়ালজোড়া কেবিনেটগুলোয় তার স্বামী উপহার পাওয়া রাজ্যের তৈজসপত্র খুব সাবধানে সাজিয়ে রাখতে লাগলো। সেগুলো সাজানোর নময় স্বামীর হাতে তুলে দিতে গিয়ে দুটো মিল্কপট ভেঙে ফেলল বলে নুজহাত বুঝলো শুধু নতুন বউ বলেই স্বামী তার হাতদুটো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো। নুজহাত তার নতুন বাসার কোনো কোণায় কোনো বইয়ের র‌্যাক বা আলমারি

খুঁজে পেল না। এমন কি এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা দুটো একটা বইও চোখে পড়লো না। কেবল টিভি কেবিনেটে থরে থরে সাজানো সিডি আর সিডি। তারই নিচের তাকে অস্ব”ছ কাঁচের আরবণে কিছু ইংরেজি প্রাপ্তবয়স্কদের ম্যাগাজিন। স্বামী রোজ রাতে নতুন নতুন হিন্দি সিনেমা আর নাচগানের সিডি চালিয়ে দেখে আর নুজহাতকেও দেখতে উৎসাহিত করে। নুজহাত কেবল বিস্মিত হয় আর বিস্মিত হয়। ওর অপরিণামদর্শন ওকে পলে পলে দগ্ধ করে। তবুও স্বামীকে সে নিজহাতে গড়ে নেবে ভেবে একদিন স্বামীর সাথে নিউ মার্কেটে গিয়ে ওর পছন্দের তালিকা অনুযায়ী কিছু দুর্লভ বই নিজের ও শ্বশুরের জন্যে কিনবে বলে দোকান দোকান ঘুরতে থাকে। দুটো বই কেনা হয়ে গেলে স্বামী বিরক্তির স্বরে তাড়া লাগায় ঘরের পর্দার কাপড় কিনে বানাতে দেয়ার কথা তাদের এবং ওটাই জর"রি। তাছাড়া দেশের বাড়ির লাইব্রেরিতে এতো বই থাকতে খামোখা নতুন বই কিনে জঞ্জাল বাড়ানোর কোনো মানে নেই। নুজহাত একেবারে হা হয়ে যায়। বলে-

'বই জঞ্জাল?'

'নয়তো কী? আমার মায়ের একটা দোতলা বাড়ির কত শখ ছিল! বাবা খালি বই কিনে কিনে সব ফতুর করেছে। মা মারা যাবার পর বাবার প্রায় দেড়শো বই উঁই পোকা কেটে দিয়েছিল। এ কি মায়ের অভিশাপ নয়?'

নুজহাত তবুও হাল ছাড়ে না। স্বামী অফিসে গেলে বই কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। কিছুদিন পরে ও বুঝতে পারে ওর আসলে এ জীবন আর ভালো লাগছে না। বই পড়ার চাহিদা ও ভেতরে ভেতরে পুষিয়ে নিলেও ও ওর হাতের কাছে কোনো বন্ধু পা"ছে না যার সাথে পড়ার পর শেয়ার করতে পারে। আর সত্যি বলতে কি ঐ নিরেট হিন্দিসিনেমাপ্রেমী স্বামীর সঙ্গ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। বিছানা তার কাছে আনন্দ দেয়ার বদলে প্রতিনিয়ত যেন বিরক্তির কন্টকশয্যায় পরিণত হতে লাগলো। নিজের শরীরের উপর একটা নিরস ঢেঁকির আন্দোলন যেদিন ওর আপত্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়েও আপন ই"ছে দীর্ঘায়িত করছিল সেদিন মাঝপথেই নুজহাতের প্রবল প্রতিরোধে ওর স্বামী খাট থেকে পড়ে গিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু দমিত হয়ে যায়। সকালেই নুজহাত কোন অজুহাত ছাড়াই বলেছিল-

'আমি আজই কিছুদিনের জন্যে আমার বাবার বাড়ি যেতে চাই।'

নুজহাতের সংকল্পবদ্ধ আরবি ঘোড়ার মতো একগুঁয়ে ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে ওর স্বামী একবারের জন্যেও আপত্তি করার সাহস পায়নি।

নুজহাতের আসার খবর পেয়ে ওর বন্ধুরা পাগলের মতো ছুটে এলো ওকে দেখতে। ওর বর ওকে রেখে ঢাকা ফিরে গেছে। সাতদিন বাদেই এসে নিয়ে যাবে। নুজহাত আগের মতোই উ"ছল হতে চাইলো কিন্তু ওর অন্যমনস্কতা বন্ধুদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। শাহিন বললো-
'সত্যি করে বলতো নুজু তুই কি সুখী?'

'ওয়াক থু'

'মানে?'

'মানে টানে বলতে পারবো না। তবে কাল স্যারের ওখানে যাব'

'মানে শ্বশুর বাড়ি? দেখিস বাবা আবার বলে বসিস না যেন স্যার আমার বিয়েটা উইথড্র করতে এসেছি'

'ইস্ এরকম নিয়ম থাকলে কী ভালোটাই না হতো!'

নুজহাত তার শ্বশুরের জন্যে কিনে আনা বইগুলো নিয়ে শ্বশুরের বড় সাধের লাইব্রেরির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চারদিক থেকে বইয়ের গন্ধে ওকে মাতাল করে তুললো। এই গন্ধ, এই আহ্বান, এই চিরকালীন হাতছানীর আমন্ত্রণে নুজহাতের বুক উজাড় করে এক অস্ফুট আনন্দধ্বনি বের হয়ে এলে ওর শ্বশুর দুহাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নিলেন। বই আর বইয়ের মানুষটার গন্ধ ওর কাছে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

ওরা অনেক রাত পর্যন্ত কোন বিশেষ বই নিয়ে আলাপ করতে করতে মানুষের জীবন ও দর্শনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে একসময় কে কখন কার পাশে গিয়ে বসেছে তা ওরা দুজনের কেউই বুঝতে পারেনি। কিন্তু নুজহাতের যখন ঘুম ভাঙলো তখন ও দেখতে পেল ওর একটা হাত স্যারের ঘাড়ের নিচে। স্যার গভীর ঘুমে আ"ছন্ন। কিন্তু নুজহাতের শরীরে কোন ক্লান্তি নেই। বিয়ের পর এই প্রথম সে অনুভব করলো তার শরীরটা পাখির পালকের মতো হালকা আর আনন্দের।